কিংকর্তব্যবিমূঢ়

কিংকর্তব্যবিমূঢ় ২ কিংকর্তব্যবিমূঢ় ৩

কিংকর্তব্যবিমূঢ় ৪ কিংকর্তব্যবিমূঢ় ৫

কিংকর্তব্যবিমূঢ় ৬ কিংকর্তব্যবিমূঢ় ৭

কিংকর্তব্যবিমূঢ় ৮ কিংকর্তব্যবিমূঢ় ৯

কিংকর্তব্যবিমূঢ় ১০ কিংকর্তব্যবিমূঢ় ১১

কিংকর্তব্যবিমূঢ় ১২ কিংকর্তব্যবিমূঢ় ১৩

কিংকর্তব্যবিমূঢ় ১৪ কিংকর্তব্যবিমূঢ় ১৫

কিংকর্তব্যবিমূঢ়
শরীফুল হাসান

অনলাইনে অর্ডার করতে
http://nalonda.com.bd

কলকাতায় পরিবেশক
বইবাংলা
স্টল ১৭, ব্লক ২, সূর্য সেন স্ট্রিট
কলেজ স্কোয়ার দক্ষিণ, কলকাতা ৭০০০১২
ফোন : +৯১৭৯০৮০৭১৭৬৫ (কলকাতা)

কিংকর্তব্যবিমূঢ়	শরীফুল হাসান
প্রকাশক	রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল নালন্দা ৩৮/৪ বাংলাবাজার (মান্নান মার্কেট) তৃতীয় তলা, ঢাকা ১১০০
স্বত্ব	নিপা ইসলাম
প্রচ্ছদ	সজল চৌধুরী
প্রথম প্রকাশ	ফেব্রুয়ারি ২০২৪
মুদ্রণ	শামীম প্রিন্টিং প্রেস
বর্ণবিন্যাস	নালন্দা কম্পিউটার বিভাগ
মূল্য	৪৫০.০০ টাকা
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক	মুক্তধারা জ্যাকসন হাইট নিউ ইয়র্ক
©	Nipa Islam
Kingkortobbobimor	
(A Novel By)	Shariful Hasan
Cover Design	Sajal Chowdhury
First Pubished	February 2024
Publisher	Redwanur Rahman Jewel Nalonda 38/4 Banglabazar (Mannan Market) 2nd Floor, Dhaka 1100
Price	450.00 Tk only
ISBN	978-984-98389-6-8
E-mail	nalonda71 @gmail.com

উ ৎ স র্গ

সালমান হক

প্রান্ত ঘোষ দস্তিদার

চমৎকার দুজন লেখক, আনুবাদক
লেখালেখি আর বইপড়া নিয়ে
তাদের উৎসাহ আমাকে দারুণ আন্দোলিত করে

ভূমিকা

আহমেদ করিমকে নিয়ে লিখতে আমাকে বেশ বেগ পেতে হয়। তিনি একা থাকেন, একসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন, এই দুটো বিষয় দিয়ে তাঁকে খুব বেকায়দা অবস্থায় ফেলে দিয়েছি আমি। কিন্তু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং কর্মপদ্ধতিতে তিনি ভিন্ন, পেশাদারিত্বে তিনি আলাদা। অলৌকিকে বিশ্বাস করেন না, আবার করেনও।

জনাব আহমেদ করিমকে নিয়ে আমার প্রথম চেষ্টা ছিল `রূপকুমারী ও স্বপ্নকুহক,। বইটির পাঠকপ্রিয়তায় তাঁকে নিয়ে আমার দ্বিতীয় প্রচেষ্টা `কিংকর্তব্যবিমূঢ়,। সামনে আরো অনেক নতুন নতুন ঝামেলায় জড়িয়ে নিজেকে প্রমাণ করবেন তাঁর প্রতি সেই বিশ্বাস আমার আছে।

সবাই ভালো থাকবেন।

লোকটা ঘরে ঢোকা মাত্রই দারুণ একটা ধাক্কা খেল তানিয়া।

ড্রয়িংরুমটা যথেষ্ট আলোকোজ্জ্বল। কিন্তু লোকটা যেন সাথে করে সমস্ত অন্ধকার নিয়ে প্রবেশ করেছে। এই মুহূর্তে লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে তানিয়া। কোনোকালেই তাকে পছন্দ ছিল না। এই মুহূর্তে আরও বিরক্ত লাগছে দেখতে। সোফায় বসে আছে কাঁচুমাচুভাবে। বয়স্ক একজন মানুষ। ফরসা গায়ের রং, মাথায় বেশ বড়সড়ো একটা টাক। পরনের শার্টটা ময়লা, প্যান্টটাও। একপাশে বড় দুটো চটের ব্যাগ। সেই ব্যাগভরতি শাকসবজি আর মাছ। একপাশে মাঝারি আকারের একটা মিষ্টির প্যাকেট। বিরক্ত হলেও সেটা কীভাবে আড়াল করতে হয় তা জানে বলে মুখে হাসি নিয়ে তাকিয়ে আছে তানিয়া।

লোকটার নাম হামজা মিয়া। শম্ভুগঞ্জের সায়েমের যে পৈত্রিক বাড়ি, তার কেয়ারটেকার। বছরে একবার দুইবার ঢাকায় আসে টাকা-পয়সা নিতে। সাথে করে নিয়ে আসে যাবতীয় শাকসবজি, মাছ এইসব। এইসব নাকি সব ঐ বাড়িতেই হয়। বাড়িতে পুকুর আছে তিনটা, মাছ আসে সেখান থেকে। এছাড়া খালি জায়গাও পড়ে আছে অনেক। সেরকম ছোট একটা জায়গায় সবজি বাগান করেছে, সেই সবজি নাকি একদম তাজা, কোনো কীটনাশক ব্যবহার হয় না। এরকম তাজা শাকসবজি আর মাছ খুবই পছন্দ তানিয়ার। কিন্তু কেন জানি লোকটাকে পছন্দ নয়।

'আমি সন্ধ্যার মইধ্যে চইল্যা যাব, বাবাজি আসবে কখন?' হামজা মিয়া বলল।

'কেন? যাবেন কেন? থাকেন?' তানিয়া বলল। হামজা মিয়া থাকুক এটা সে চায় না, শুধু ভদ্রতা করে বলা।

'না মা। আমি থাকবো না,' হামজা মিয়া বলল। তারপর বিড়বিড় করল কিছুক্ষণ। মনে হলো কারও সাথে কথা বলছে। এইরকম উদ্ভট, অদ্ভুত

একটা লোককে সায়েম কেন এত পছন্দ করে কে জানে! তার শ্বশুর-শাশুড়ির কাছেও বেশ প্রিয় ছিল লোকটা।

বাইরে বৃষ্টি নেমেছে। ঝুম বৃষ্টি। এখন বিকেল চারটা বাজে। কিন্তু চারপাশ অন্ধকার হয়ে গেছে। এই বৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছে হামজা মিয়া চাইলেও এখন যেতে পারবে না। আর সায়েম কখন আসবে তার ঠিক নেই। এমনিতেই সাত-আটটা বাজে ফিরতে ফিরতে।

'ও তো সাতটা-আটটার আগে আসবে না,' তানিয়া বলল।

'তহুরারে ডাকেন একটু, অনেকদিন ওরে দেখি না।'

'ও তো ঘুমাচ্ছে। ডাকব?'

'না থাক। তাইলে আমি যাই,' হামজা মিয়া বলল। 'মুক্তাগাছার মন্ডা নিয়া আসছিলাম এক কেজি। মনে কইরা খাইয়ো। বাজানের খুব পছন্দের জিনিস। খুব নামকরা জিনিস।'

'আচ্ছা।'

'আমি উঠি তাহলে।'

'এই বৃষ্টির মধ্যে যাবেন?'

'বৃষ্টি কোনো বিষয় না, আমি যে কাজ করতে আইছিলাম সেইটা করা হইছে।'

তানিয়া একটু অবাক হলো। লোকটা সাধারণত টাকা-পয়সা নিতে আসে। বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামতের জন্য বছরে বেশ ভালো একটা টাকা সায়েম খরচ করে। কিন্তু এবার তো টাকা না নিয়েই ফিরে যাচ্ছে।

'কিন্তু, আপনি তো কোনো টাকা-পয়সা নেননি।'

'টাকা-পয়সা লাগবো না, মা।'

'কিন্তু...'

তানিয়া আর কিছু বলার আগেই দেখল হামজা মিয়া দরজার কাছে চলে গেছে। তারপর বেরিয়ে গেল।

ড্রয়িংরুমের জানালার কাছে এগিয়ে গেল তানিয়া। নিচে হামজা মিয়াকে দেখা যাচ্ছে। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বাড়ির গেট পার করল। এত ব্যস্ত হয়ে এই বৃষ্টির মধ্যে চলে যাওয়ার কী আছে? কিছুই বুঝতে পারল না তানিয়া।

দরজাটা বন্ধ করে চটের ব্যাগ দুটো রান্নাঘরে রাখল। মিষ্টির প্যাকেটটা ফ্রিজে তুলে রাখল, তবে তুলে রাখার আগে প্যাকেট খুলে দুটো মন্ডা বের

করল। পাতলা কাগজে মোড়া, দুধে তৈরি জিনিসটা এর আগে একবার খেয়েছিল। সেটাও বহুবছর আগের কথা। স্বাদ এখন আর মনে নেই। মন্ডাটা অল্প ভেঙে খেল। আরেক পিস ডাইনিং টেবিলের উপর প্লেটে তুলে রাখল। সায়েম এলে খেতে দেবে।

ড্রয়িংরুমের সোফায় এসে বসল তানিয়া। পুরো রুমটা একদম ঠান্ডা হয়ে আছে। বরফের এত শীতল। সোফার একপাশ থেকে রিমোট কন্ট্রোলটা তুলে নিল এয়ারকুলারটা বন্ধ করার জন্য। কিন্তু এয়ারকুলার তো চালানোই হয়নি।

বাসার কাজের মেয়েটা দুপুরে ঘুমায়। রান্নাঘরের সাথে ছোট একটা সার্ভেন্টস রুম আছে, ওখানে। এছাড়া বাসায় এই মুহূর্তে আর কেউ নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে তানিয়ার মনে হচ্ছে কেউ এসে বসেছে তার পাশে।

টেলিভিশনের রিমোট নিয়ে সেটা অন করল তানিয়া। তাতে ঘরটা বেশ আলোকিত হলো। বাইরে বৃষ্টির তেজ আরও বেড়েছে। টেলিভিশনে তেমন কিছু হচ্ছিল না। হঠাৎ করেই টেলিভিশনের স্ক্রিনে শুধু ঝিরঝিরি আসছিল। বৃষ্টিতে মাঝে মাঝে ডিশ লাইনের সমস্যা হয়। টেলিভিশন বন্ধ করার জন্য রিমোট কন্ট্রোলটা হাতে নিতে গিয়ে চমকে গেল তানিয়া। একটু আগে ঠিক পাশেই রেখেছিল। এখন সেখানে নেই।

সেটা এখন মেঝেতে পড়ে আছে। আমার হাতের ধাক্কায় কার্পেটে ঢাকা মেঝেতে পড়েছে বলে কোনো শব্দ হয়নি, ভাবল তানিয়া। বাইরে অনেক শব্দে বাজ পড়ল কোথাও। চমকে উঠল।

তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এখন মাত্র সাড়ে চারটা বাজে। এই সময় সায়েমের বাসায় ফেরার কথা নয়। কিন্তু গেটে পুরানো ক্যামরি গাড়িটার হর্ন শোনা গেল। দারোয়ান এখন গেট খুলে দেবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সায়েম আসবে। আর সায়েম এলে কোনো কিছুতেই ভয় পাবে না তানিয়া।

সায়েম এসেছে। অন্যান্য দিন বাসায় ফিরে অন্তত কিছু কথা বলে। কিন্তু আজ কোনো কারণে মনমেজাজ খারাপ। তাই ওকে তেমন ঘাঁটাল না তানিয়া। শুধু বলল বাড়ি থেকে হামজা মিয়া এসেছিল, কিছু জিনিসপত্র দিয়ে চলে গেছে। সায়েম শুনল শুধু, তবে কিছু বলল না। খাওয়া-দাওয়া শেষে, টিভি দেখে, গল্পগুজব শেষে একসাথে ঘুমাতে গেল দুজন।

সায়েম হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর চলে এসেছে। চারপাশে ঘন হয়ে আছে অন্ধকার, অনেক দূরে মিটমিট করে একটা আলো জ্বলছে। এই আলো লক্ষ করে হাঁটা যায়। কিন্তু হাঁটতে গিয়ে লক্ষ করল পা ফেলতে কষ্ট হচ্ছে। পায়ের নিচে র মাটি থকথকে কাদার এত আঠালো। এক পা তুলতে গিয়ে আরেক পা আটকে যাচ্ছে। এভাবে বেশিদূর এগোনো যাবে না। চারপাশ থেকে শোঁ শোঁ শব্দে হাওয়া বইছে।

সায়েমের ইচ্ছে করছে চেঁচিয়ে কাউকে ডাকতে। কিন্তু মনে হচ্ছে এই পৃথিবীতে আর কারও কোনো অস্তিত্ব নেই। আছে শুধু এই ফাঁকা অন্ধকার আর ঝড়ো বাতাস। এখানে কীভাবে এলো সে? কখন এলো?

সায়েম এসব প্রশ্নের উত্তর জানে না। আপাতত জানতেও চাচ্ছে না। এখান থেকে মুক্ত হওয়া দরকার। হাঁটার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছে বারবার। দূরের সেই মিটিমিটি আলোটা অল্প অল্প করে এগিয়ে আসছে। পা তোলার চেষ্টা বাদ দিয়ে আলোটার দিকে তাকাল।

আলোটা একটা হারিকেন থেকে আসছে। যে মানুষটা হারিকেন ধরে আছে তাকে দেখা যাচ্ছে না। লোকটার পরনে কালো একটা চাদর, সে চাদরে ঊর্ধ্বাঙ্গ ঢেকে আছে।

'আমাকে বাঁচান, কে আপনি? আমাকে বাঁচান,' সায়েম চেঁচাল প্রাণপণে।

'তোর মুক্তি নেই,' ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল লোকটা। কণ্ঠস্বর শুনে চমকে গেল সায়েম।

মনে হচ্ছে মৃত কোনো শরীর থেকে ভেসে আসছে কণ্ঠস্বরটা। একই সাথে কণ্ঠস্বরটা খুব চেনা লাগছে।

'আপনি কে? আমি এখানে কেন?'

'তুই হঠকারী। প্রতারক। অবিশ্বাসী। তোর শাস্তি অবশ্যম্ভাবী।'

'কীসের শাস্তি?'

'তুই জানিস কীসের শাস্তি! জানিস না?'

বলল লোকটা। দমকা বাতাসে হারিনেকের আলোটা নিভে গেল দপ করে। গাঢ় অন্ধকার গ্রাস করে নিল সায়েমকে। দম বন্ধ হয়ে আসছে। কয়েক সহস্র সরু লতাপাতা নিচের কাদাময় পথ থেকে প্যাঁচিয়ে ধরেছে গলা। চেঁচিয়ে উঠল সায়েম।

সায়েম দেখল তানিয়া তার মুখের উপর ঝুঁকে আছে। মেয়েটাকে আশ্বস্ত করার জন্যই সে হাসল। যদিও তাতে কোনো লাভ হলো না। তানিয়া বেডসুইচ চেপে রুমের বাতি জ্বালিয়েছে। সেই আলোয় সায়েমের মুখের হাসিটাকে বেশ বোকা বোকা লাগছিল।

'আজ কী দেখলে স্বপ্নে?' তানিয়া জিজ্ঞেস করল।

'না, কিছু না,' কোনোমতে বলল সায়েম।

'পানি খাও,' বলে এক গ্লাস পানি এগিয়ে দিল তানিয়া। বিছানার পাশেই ছোট সাইড টেবিলে কাচের জগ আর গ্লাস থাকে সবসময়।

সায়েম ঢকঢক করে পানি খেয়ে নিল। সত্যিই তার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। সারা শরীর ঘেমে আছে, যদিও রুমে এসি চলছে। খাওয়া শেষে পানির গ্লাসটা দিল তানিয়ার হাতে।

'যেভাবে শব্দ করছিলে, মনে হচ্ছিল কেউ তোমার গলা টিপে ধরেছে,' তানিয়া বলল।

'আরে না, তোমাকে তো আগেই বলেছি আমাকে বোবায় ধরে মাঝে মাঝে।'

'আমার কেন জানি তা মনে হয় না,' তানিয়া বলল, 'যাক, সকালে অফিস। ঘুমাও। বাতি নিভিয়ে দেব?'

'দাও।'

তানিয়া বাতি নিভিয়ে দিয়ে পাশ ফিরে শুল। সায়েম অন্ধকারের মধ্যেই তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। একটু আগে দেখা স্বপ্নের বিস্তারিত তানিয়াকে বলা যাচ্ছে না। এর আগেও ভয়ংকর সব স্বপ্ন দেখে তার ঘুম ভেঙেছে। সেসব স্বপ্নের কথা তানিয়াকে বলেছে। কিন্তু বারবার এসব স্বপ্নের কথা বলে মেয়েটাকে আরও ভয় দেখাতে চায় না।

আরও অনেকক্ষণ জেগে রইল সায়েম। অন্ধকার ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় মনে হলো অনেকগুলো ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে

ঘোরাঘুরি করছে চারপাশে। পা টিপে টিপে হাঁটছে। তবে সেসবকে পাত্তা দিল না সায়েম। শুধু দম বন্ধ করে রইল। মনে হলো ওরা যদি টের পায় সে জেগে আছে তাহলে সমস্যা হবে। তবে খুব বেশিক্ষণ চলল না এসব। একসময় নিজেই ঘুমিয়ে পড়ল সায়েম। গাঢ়, গভীর ঘুম।

* * *

সায়েম চৌধুরির বয়স তেতাল্লিশ। হালকা-পাতলা গড়নের ধবধবে ফরসা একজন মানুষ। সবসময় ফিটফাট হয়ে থাকতে পছন্দ করে। মাথাভরতি ঘন কালো চুল। চোখদুটি বড় বড়, টানা ভুরু। মা বলতেন একদম দাদির এত হয়েছে দেখতে। তার দাদির নাম ছিল পরি বিবি। পরির এতই সুন্দরী। মাঝে মাঝে পুরানো বাড়িটায় গেলে দেয়ালে ঝোলানো পোট্রেটের দিকে একবার হলেও তাকায় সায়েম। চেহারার মিল খোঁজে। আসলেই দারুণ মিল। দাদা আর বাবা দুজনেই প্রায় কালোর দিকে। সেক্ষেত্রে মা যে বলতেন দাদির এত দেখতে তাতে আসলে কোনো ভুল নেই। সারা সকাল দারুণ ব্যস্ততায় কাটল সায়েমের। অনেকগুলো মিটিং ছিল। এক এক করে মিটিংগুলো সারল। দুপুরে নিজের রুমেই লাঞ্চ করল। ঘুম পাচ্ছিল। পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট শাহানাকে বলে দিল কেউ যেন তাকে বিরক্ত না করে।

অফিসের এই রুমটা বেশ বড়। দামি অফিসিয়াল ডেস্ক ছাড়াও একপাশে দামি সোফা, দেয়ালে ঝোলানো টিভি, ফ্রিজ আছে। সকাল থেকে একটানা এয়ারকুলার চলে বলে বাইরে থেকে কেউ ঢুকলে শীতে কেঁপে ওঠে। কিন্তু সায়েমের কাছে এই তাপমাত্রা স্বাভাবিকই লাগে।

লাঞ্চ শেষে একটা সিগারেট ধরিয়ে সোফায় গিয়ে বসল সায়েম। সামনের ছোট টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে আয়েশ করে সিগারেট টানতে লাগল। এত ঘুম পাচ্ছে যে অ্যাশট্রেতে ছাই ফেলতেও ইচ্ছে হচ্ছিল না। কোনোমতে সিগারেটের আগুন নিভিয়ে সোফায় হেলান দিল। ঘুমিয়ে পড়ল সাথে সাথেই।

তবে ঘুম এলো না। অস্বস্তি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল কেউ তার মুখের উপর ঝুঁকে আছে। রাশেদ নামে এক বন্ধু ছিল। মাঝে মাঝে এরকম

ফাজলামি ন করত। কিন্তু প্রায় ছয় বছর হলো কানাডায় চলে গেছে রাশেদ। তার সাথে এরকম ফাজলামি করার এত বন্ধু আর কেউ নেই।

চোখ খুলল না সায়েম। যেভাবে হেলান দিয়ে শুয়েছিল সেভাবেই শুয়ে রইল। অনুভূতিটা খুব স্পষ্ট। কেউ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। এত তীব্র সে অনুভূতি যে চোখ খুলতে বাধ্য হলো। ভেবেছিল সত্যি সত্যি দেখবে কেউ ঝুঁকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু তেমন কিছু দেখা গেল না। তাতে বরং স্বস্তিই পেল সায়েম।

ধীর পায়ে উঠে ফ্রিজ খুলল। অতিথিদের জন্য, নিজের জন্য কিছু পানীয় রাখা থাকে। একটা ঠান্ডা বিয়ারের বোতল বের করে আনল। সাবধানে ছিপি খুলে গ্লাসে ঢালল।

টেনশনের সময় নার্ভ শান্ত রাখার জন্য বিয়ার বেশ উপযোগী জিনিস। আজকের শেষ মিটিংটা খুব দরকারি ছিল। নিজের মতে একদম অনড় রয়েছে সায়েম। সে আজ পর্যন্ত কোম্পানির কোনো কিছুতে দুর্নীতি করেনি, করবেও না। এই কোম্পানি আজ এত বড় হয়েছে এতে অন্যান্যদের চেয়ে তার অবদানই বেশি। অথচ বোর্ড অভ ডিরেক্টর্সের নতুন কিছু সদস্য এমন আচরণ করছে যে ইদানীং সে যে সিদ্ধান্ত নিতে চাচ্ছে তাতেই বাগড়া বসাচ্ছে। এমনকি তার সততা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। ওরা পরিষ্কার জানে, সায়েমের কোনো উত্তরাধিকার নেই। যে পরিমাণ অর্থ-সম্পদ আছে তাতে দুজন মানুষের অনায়াসে পুরো জীবন পার হয়ে যাবে। অথচ বোর্ড অভ ডিরেক্টর্সের কিছু কিছু লোক এক জোট হয়ে তাকে আলাদা করতে চাইছে। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে শুরু করে সরকারি বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে ভুল তথ্য দিয়ে তার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে।

এসব কথা এখন ভাবতে চাচ্ছে না সায়েম। বিয়ারের বোতলটা হাতে নিয়ে আবার সোফায় গিয়ে বদল। আরেকটা সিগারেট ধরাতে গিয়েও ধরাল না। দুপুরের এই সময়টা অফিস গমগম করে লোকজনে। কিন্তু আজ রুমের বাইরে থেকে কোনো শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে কোথাও কোনো শব্দ নেই। রুমে এয়ারকুলারটা চলছে, এর বাইরে পৃথিবীতে কোথাও কোনো শব্দ নেই।

বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিয়ে আবার সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল সায়েম। পায়চারি করল কিছুক্ষণ। অস্থিরতা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে কোথাও কোনো একটা ঝামেলা আছে। না হলে মানসিকভাবে এতটা অস্থিরতা থাকার কথা নয়।

দরজা খুলে বাইরে তাকাতে অবাক হয়ে গেল সায়েম। পুরো অসিফ ফাঁকা। কেউ নেই। সবগুলো চেয়ার-টেবিলের দিকে তাকাল। কম্পিউটারগুলো চলছে, কিছু ডেস্কের উপর মোবাইল ফোন দেখা যাচ্ছে, কিছু ডেস্কে কাগজ এলোমেলো পড়ে আছে। মনে হচ্ছে মুহূর্তের নোটিশে সবকিছু ফেলে চলে গেছে অফিসের লোকগুলো। চারপাশে কোনো শব্দ নেই। বাইরে থেকে প্রচণ্ড রোদ আসছে কাচের জানালা দিয়ে। আলোয় ঝলমল করছে পুরো অফিস, কিন্তু কেউ নেই।

এক পা এক পা করে যেএ এগোচ্ছে সায়েম। মনে হচ্ছে খুব বাজে কিছু দেখতে পাবে কোথাও। কিন্তু তেমন কিছু দেখা গেল না। তার সেক্রেটারি শাহানা সবার পেছনের একটা ডেস্কে বসে। মেয়েটার টেবিলের দিকে তাকাল। টিফিন ক্যারিয়ারটা খোলা পড়ে আছে। মনে হচ্ছে খেতে বসেছিল মেয়েটা, তারপর জরুরি কোনো কাজে খাওয়া ফেলেই বেরিয়ে গেছে।

এসবই আমার কল্পনা, নিজেকে বলল সায়েম। আমি এখন সোফায় হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে আছি, দুঃস্বপ্ন দেখছি। নিজের হাতে চিমটি কাটল, বেশ জোরেই কেটেছিল চিমটিটা। আঁতকে উঠল। না, স্বপ্ন দেখছে না সে।

চারতলার এই ফ্লোরটায় প্রায় পঁচিশজন বসে। এদের সবাই একসাথে কোথায় গেছে, কেন গেছে? যাওয়ার আগে তাকে জানিয়ে যায়নি কেন? প্রশ্নগুলোর উত্তর জানা দরকার। মোবাইল ফোনটা রুমে রেখে এসেছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক তার ফোনে কোনো কল আসেনি। অথচ দুপুরের এই সময়টা ফোন রিসিভ করতে করতে মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে যায়।

ডানদিকের একটা ডেস্কের পেছনে খুট করে শব্দ হলো। চমকে পেছনে তাকাল সায়েম। মনে হচ্ছে ডেস্কের আড়ালে কেউ লুকিয়ে আছে। শাহানার ডেস্ক থেকে একটা স্টিলের রুলার খুব সাবধানে নিজের হাতে তুলে নিল। তেমন কিছু দেখলে আঘাত করতে দেরি করবে না।

এক পা এক পা করে ডেস্কের দিকে যেএ এগোচ্ছে সায়েম। বুক ধুকপুক করছে। মনে হচ্ছে খুব বাজে কিছু দেখবে। খুব বাজে। রুলারটা শক্ত হাতে ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রস্তুত যেকোনো পরিস্থিতির জন্য।

ডেস্কের আড়ালে যা দেখল তার জন্য প্রস্তুত ছিল না সায়েম। তবে দেখার সাথে সাথে স্টিলের রুলারটা হাত থেকে ফেলে দিল। এগিয়ে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল মানুষটার সামনে।